ভেতরে

এই সংখ্যা চার পাতার

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ও তার তাৎপর্য ... ২

রাজনৈতিক মানচিত্রে পট পরিবর্তন বামেদের ... মোকাবিলা কোন পথে? ... ৩

আজকের দেশব্রতী

₹ ১.০০

পত্রিকা প্রকাশিত হয় প্রতি বৃহস্পতিবার,
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮
বার্ষিক গ্রাহক — ১০০ টাকা
(৪৮টি সাধারণ সংখ্যা ও একটি বিশেষ সংখ্যা)
ষান্মাসিক গ্রাহক — ৫০ টাকা (২৬টি সংখ্যা)
১০টি বার্ষিক গ্রাহক একত্রে জমা দিলে
প্রতি সংখ্যায় ১টি পত্রিকা বিনামূল্যে

খণ্ড ২১ সংখ্যা ১৫ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র ২৯ মে ২০১৪

২৫ মে নকশালবাড়ি দিবস উদযাপন

২৫ মে নকশালবাড়ি দিবস রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উদযাপিত হল। নকশালবাড়ির মর্মবস্তু অর্থাৎ বুনিয়াদী কৃষক জনগণের জাগরণ এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ, পরিস্থিতির বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে সংগ্রাম ও সংগঠনের নতুন নতুন রূপের মধ্যে সেই অন্তর্বস্তুকে প্রবাহিত করা—এই মৌলিক দিশাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে শ্লোগান তোলা হয় ''নকশালবাড়ির শহীদদের জানাই লাল সেলাম", ''ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিপ্লবী দিশা প্রদানকারী নকশালবাড়ি লাল সেলাম", ''কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকতর গণসংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলো।" এই আহ্বানকে তুলে ধরে কলকাতায় রাজ্য অফিসের নীচে অবস্থিত শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের কেন্দ্রীয় কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য অমলেন্দু চৌধুরী, রাজ্য অফিস সম্পাদক জয়তু দেশমুখ, কলকাতা জেলা সম্পাদক ধীরেশ গোস্বামী, কলকাতা জেলা কমিটি সদস্য বাবুন চ্যাটার্জী, রাজ্য অফিস টিমের সদস্য সুরেশ মণ্ডল।

শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য নেত্রী গৌরী দে। ঘরোয়া আলোচনায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন জেলা নেতা পুলক গাঙ্গুলী ও অপু চতুর্বেদী। বাঘাযতীন পার্ক সংলগ্ন কমরেড চারু মজুমদারের মূর্তিতে মাল্যদান করে নকশালবাড়ি আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। শ্রদ্ধা জানান রাজ্য নেত্রী গৌরী দে, জেলা সদস্য পুলক গাঙ্গুলী, মোজাম্মেল হক, অপু চতুর্বেদী, মুক্তি সরকার, ছাত্র-যুব নেতা প্রদীপন গাঙ্গুলী, শাশ্বতী সেনগুপ্ত, অনীক চক্রবর্তী প্রমুখ। শচীন্দ্র চন্দ্র চা বাগানে খড়িবাড়ি ব্লকের পার্টির নতুন কার্যালয়ের উদ্বোধন হয়। পতাকা উত্তোলন করেন ৭০ দশকের বর্ষীয়ান নেতা তারাবাড়ি অঞ্চলের কমরেড নেওয়া। শ্রদ্ধা জানান পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু, পবিত্র সিংহ ও খড়িবাড়ি ব্লকের সম্পাদক চানেশ্বর সিংহ, কান্দ্রা মুর্মু, লালু ওঁরাও সহ ব্লকের ও বাগানের বিভিন্ন সদস্য। উদ্বোধন করেন পার্টির রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু। নতুন কার্যালয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখা হয়। কমরেড পবিত্র সিংহ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের রূপরেখা উপস্থিত সদস্যদের অবহিত করেন। বিকালে রাঙ্গাপানিতে এক প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আগে নকশালবাড়ি দিবসকে স্মরণ করে বড়পথুজোত, ছোটপথুজোতে এক বর্ণাঢ্য মিছিল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন পার্টির রাজ্য, জেলা ও স্থানীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ। মিছিল শেষে সভায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মীরা চতুর্বেদী। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটি সদস্য বাসুদেব বসু ও জেলা কমিটি সদস্য পুলক গাঙ্গুলী। সভা পরিচালনা করেন রাজ্য ও জেলা নেতা পবিত্র সিংহ।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাতে মাল্যদান করেন লোকাল কমিটি সদস্য মহিলা নেত্রী মায়া মুখার্জী, দেশব্রতী পত্রিকার সম্পাদক অনিমেষ চক্রবর্তী, জেলা কমিটি সদস্য নির্মল ঘোষ, বারাসাত লোকাল কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। নির্মল ঘোষ তার বক্তব্যে নকশালবাড়ি দিবসের বুনিয়াদী শ্রেণী সংগ্রামের তাৎপর্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, শ্রমজীবী মানুষের কাজের ঘন্টা বেড়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে এবং কাজের ন্যায্য দামের দাবিতে বৃহত্তর গণসংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে। কর্পোরেট ফ্যাসিবাদী শক্তির ক্ষমতায় আসার পর এস সংগ্রামের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে।

জলপাইগুড়ি শহরে জেলা অফিসে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক সুব্রত চক্রবর্তী, জেলা সদস্য মুকুল চক্রবর্তী। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন বর্ষীয়ান জেলা নেতা বিজন সরকার। গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন মিহির সেন।

হুগলী জেলার কোন্নগরে লোকাল পার্টি অফিসে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও শহীদ স্মরণে অংশগ্রহণ করেন লোকাল কমিটির সদস্যরা।

হাওড়া জেলার বাগনানে শহীদদের স্মৃতিতে পতাকা উত্তোলন হয়। আরুপাড়া-কামারডাঙ্গায় পতাকা উত্তোলন হয়। বিকালে সাধারণ সভা হয়। সেখানে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিষয়ে আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক দেবব্রত ভক্ত। বালীতে শহীদ বেদীতে পতাকা উত্তোলন করা হয়, সন্ধ্যায় জনসভা হয়। সেখানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন অমিতাভ ব্যানার্জী। আইসার পক্ষে বক্তব্য রাখেন নীলাশীষ বসু। গণসঙ্গীত পরিবেশন করে সংযোগ সংস্থা। বক্তব্য রাখেন রঘুপতি গাঙ্গুলী, দীপক চক্রবর্তী। মূল বক্তা ছিলেন সি পি আই (এম এল) রাজ্য কমিটি সদস্য জয়তু দেশমুখ। তিনি নকশালবাড়ি দিবসের তাৎপর্য এবং প্রাসঙ্গিকতা এবং সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কলকাতার বাঘা যতীন মোড়ে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন টালিগঞ্জ লোকাল কমিটির সম্পাদক তাপস মাইতি ও অন্যান্য সদস্যরা। বাঘা যতীন, যাদবপুর, পল্লীশ্রী, বাঁশদ্রোণীতে পথসভা করা হয়। বক্তব্য রাখেন ইন্দ্রাণী দত্ত, সৌমিত্র বসু, জ্যোতি ভট্টাচার্য।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম এল)/এ আই এল সি-র ফলাফল

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে সি পি আই (এম এল) ১৫টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে ৮৩ জন প্রার্থীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামিয়েছিল। উত্তরপ্রদেশে একজনের প্রার্থীপদ বাতিল হওয়ার পর ৮২ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকে। পার্টি ১০ লক্ষের সামান্য বেশি ভোট পেয়েছে যা ২০০৯ সালে পাওয়া ভোটের প্রায় সমান। তবে নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা এবং প্রদত্ত ভোটের হারে বৃদ্ধিকে বিবেচনা করলে আমাদের ভোটের হার সামান্য কমেছে এবং সারা ভারতে প্রদত্ত ভোটের ০.২ শতাংশ আমরা পেয়েছি।

যে সমস্ত আসনে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি তার অধিকাংশতেই যে 'সম্মানজনক' ভোট আমরা পাব না সে কথা আমরা জানতাম। এ সত্ত্বেও আমরা আমাদের কাজের প্রায় সমস্ত অঞ্চলেই প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, কেননা নির্বাচন জনগণের জ্বলন্ত ইস্যুগুলোতে প্রচার করা এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণকে তুলে ধরার সুযোগ দেওয়া ছাড়াও আমাদের কাজের মূল্যায়ন এবং আমাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে মাপার সুযোগও দেয়।

আমাদের লক্ষ্য ছিল সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের এলাকাগুলোতে কম করে ১০,০০০ ভোট এবং অন্যান্য অঞ্চল/আসনে ন্যূনতম ৫,০০০ ভোট পাওয়া। আমাদের ফলাফল দেখিয়ে দিচ্ছে, ১৫টা আসনে আমরা ১০,০০০-এর বেশি ভোট এবং আরও ২৯টা আসনে ৫০০০-এর বেশি ভোট পেয়েছি। নয় নয় করে ২১টা আসনে আমরা ৩,০০০-এর গণ্ডিকেও ছুঁতে পারিনি।

প্রার্থী ও প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে রাজ্যওয়ারি ফলাফল এরকম

রাজ্য	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট
বিহার	২৩	৪,৬৩,০৪৫
ঝাড়খণ্ড	৮	৩,১৯,২২২
আসাম	৫	৪২,০১৫
উত্তরপ্রদেশ	১০	৩৭,৭১২
পশ্চিমবাংলা	৫	৩৪,৮৪৩
উড়িষ্যা	৩	২৫,১৯৭
তামিলনাড়ু	৫	১৩,০৮১
পাঞ্জাব	৩	১১,৬০৫
উত্তরাখণ্ড	৩	১১,৩৯২
গুজরাট	১	৯,৭০২
রাজস্থান	৩	৯,৫১২
ত্রিপুরা	২	৮,৬৭০
কর্ণাটক	৪	৭,৮৮৫
অন্ধ্রপ্রদেশ	২	৬,৬২৬
ছত্তিশগড়	২	৩,৯২৫
কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল	৩	২,৮৪২

আমাদের সবচেয়ে ভালো ফল হয়েছে ঝাড়খণ্ডের কোডারমা আসনে, যেখানে ভোট ২০০৯-এর প্রায় ১,৫০,০০০ থেকে ভালো পরিমাণ বেড়ে ২,৬৫,০০০-এর বেশি হওয়া সত্ত্বেও আমরা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছি। বিহারে আরা এবং সিওয়ান কেন্দ্রে আমরা পুনরায় তৃতীয় স্থান লাভ করেছি, আসনগুলোতে প্রাপ্ত ভোট যথাক্রমে হল ৯৮,৮০৫ এবং ৮২,০০৬। বিহারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলোর মধ্যে পাটলিপুত্র আসনে আমরা পেয়েছি ৫১,৬২৩ ভোট, জাহানাবাদে পেয়েছি ৩৪,৩৬৫ ভোট, কারাকাটে ৩২,৬৮৬ ভোট এবং নালন্দায় ১৯,৪৭৭ ভোট। পাটলিপুত্র, নালন্দা ও সিওয়ানে ভোট ২০০৯-এর তুলনায় অল্প পরিমাণ বেড়েছে এবং আরাতে ১৯৮৯-এর পর এই প্রথমবার আমরা ১ লক্ষর গণ্ডি পেরোতে পারিনি।

এবারের নির্বাচনে যে সমস্ত আসনে ভোট ভালো মাত্রায় কমেছে সেগুলো হল কোরাপুট (উড়িষ্যা), স্বায়ত্তশাসিত জেলা (আসাম) ও কাটিহার (বিহার)। প্রথমবারের মত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যে সমস্ত আসনে আমরা ইতিবাচকভাবে শুরু করতে পেরেছি বা যে আসনগুলোতে ভোট আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে সেগুলো হল ঝাড়খণ্ডের লোহারদাগা, উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল, বিহারে সুপাউল ও ভাগলপুর, আসামে কোলিয়াবোর, তামিলনাড়ুর শ্রীপেরেমবুদুর ও ভিল্লুপুরম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে চণ্ডিগড়।

সারা ভারত বাম সমন্বয়ের মধ্যে আমাদের শরিকরাও এই নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। সি পি এম (পাঞ্জাব) তিনটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (পাঞ্জাবে) প্রায় ২৪,০০০ ভোট পেয়েছে, লাল নিশান পার্টি (লেনিনবাদী) মহারাষ্ট্রের কোলাপুর আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ৭০৬৭ ভোট এবং আর এম পি কেরলে ৭টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পেয়েছে ৫০,৭০৫ ভোট। দার্জিলিং আসনে সি পি আর এম এবং সি পি আই (এম এল) যৌথভাবে নির্দলীয় প্রার্থী মহেন্দ্র লামাকে সমর্থন করে যিনি ৫৫,৭৬৭টি ভোট পান।

হিন্দুস্থান মোটরসে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের প্রতিবাদে মিছিল

গত ২৪ মে ভোররাতে হিন্দুস্থান মোটরস কর্তৃপক্ষ কোনও প্রকার আগাম নোটিশ না দিয়ে কারখানা গেটে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। এর ফলে ২৪০০ শ্রমিকের কাজ চলে যায়। ঘটনাটির খবর আসা মাত্র ২৫ মে সকালবেলা সি পি আই (এম এল) লিবারেশন পার্টির স্থানীয় নেতা প্রদীপ সরকারের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল কারখানায় যান ও সেখানে গিয়ে শ্রমিকদের সাথে কথাবার্তা বলেন। বিগত ৬ মাস ধরে শ্রমিকদের বেতন বকেয়া রেখে দেওয়া হয়েছে। যদিও এই নিয়ে বর্তমানে কারখানার প্রিন্সিপাল বার্গেনিং এজেন্ট ইউনিয়ন আই এন টি টি ইউ সি, দোলা সেন যার নেত্রী, শ্রমিকদের নিয়ে কোনও প্রকার আন্দোলনের কর্মসূচী নেয়নি। প্রতিনিধিদলের সাথে কারখানার সংগ্রামী ইউনিয়ন এস এস কে ইউ নেতৃত্বের কথা হয়। সেখান থেকেই জানা যায় পরিকল্পিতভাবে যাতে শ্রমিক আন্দোলন না গড়ে উঠতে পারে তাতে সংগ্রামী ইউনিয়নের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের ওপর নানারকমভাবে দমনপীড়ন নামানো হচ্ছে।

বন্ধ ও রুগ্ন কারখানা খোলা ও পুনরুজ্জীবনের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি এখন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এরই প্রতিবাদে পার্টির হিন্দমোটর-কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটি, এ আই সি সি টি ইউ এবং নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের উদ্যোগে সন্ধ্যা ৬টায় প্রায় ১০০ জনের একটি প্রতিবাদী মিছিল কোতরং ২ নং বাজার থেকে বেরিয়ে হিন্দমোটর স্টেশন চত্বর পরিক্রমা করে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন অপূর্ব ঘোষ, প্রদীপ সরকার, দীপঙ্কর সেনগুপ্ত, গজানন সাহা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। মিছিল থেকে দাবি তোলা হয় ''অবিলম্বে হিন্দুস্থান মোটরসে শ্রমিকদের ৬ মাসের বেতন বকেয়া রেখে মালিকপক্ষের একতরফা সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক বেআইনি ঘোষণা করতে হবে" ও ''হিন্দুস্থান মোটরসের শ্রমিকদের জীবন জীবিকার দায়ভার রাজ্য সরকারকে নিতে হবে"।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ও তার তাৎপর্য

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলে কোন অপ্রত্যাশিত ব্যাপার যদি থেকে থাকে তবে তা এই ঘটনার মধ্যে নেই যে বিজেপি নেতৃত্বাধীনেই আগামী সরকার গঠিত হতে যাচ্ছে, তা রয়েছে এন ডি এ যে ধরণের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তার মধ্যে। বিজেপির এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ এবং এর আগে তার পাওয়া সবচেয়ে বেশি আসন সংখ্যার চেয়ে এবারের আসন সংখ্যা আরও প্রায় ১০০ বেশি হওয়াটা অধিকাংশ জনমত ও বুথফেরত সমীক্ষার ভবিষ্যৎবাণীকে ছাপিয়ে গেছে।

মাত্র ১০ বছর আগে আমরা এন ডি এ সরকারকে নির্বাচনে পরাজিত হয়ে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে দেখেছিলাম। সেটা এমনই সময় ছিল যখন ভারতবর্ষ জুড়ে হাজার হাজার কৃষকের আত্মহত্যা এবং বিজেপি শাসিত গুজরাটে কয়েক হাজার মুসলিম পরিবার ধ্বংস হওয়ার পরও এন ডি এ দাবি করেছিল যে ভারতবাসীরা 'সুখ অনুভব' করছে। গুজরাট গণহত্যা এবং যাঁর শাসনাধীনে তা ঘটেছিল সেই ব্যক্তিকেই আত্মতুষ্ট বিজেপি/এন ডি এ-র 'অপ্রত্যাশিত' পরাজয়ের পিছনে মূল কারণ বলে মনে করা হয়েছিল।

১০ বছর পর এবারের নির্বাচন যদি সেই নরেন্দ্র মোদীকেই—যিনি নিজেকে 'সুদিন'-এর বার্তাবাহক বলে দাবি করছেন—প্রধানমন্ত্রীর আসনে তুলে ধরে থাকে তবে আপাত-বিরোধী এই ঘটনা আশু পরিস্থিতি ও বিকাশমান পরিপ্রেক্ষিত এবং ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার অসংগতিগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে।

ব্যাপক দুর্নীতি, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান লোপ পাওয়া এবং দায়িত্বহীন ও অসংবেদনশীল প্রশাসনই ইউ পি এ সরকারের, বিশেষভাবে শেষ কবছরে, বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত বিধানসভার নির্বাচনগুলোর ফলাফলে কংগ্রেস/ইউ পি এ-র অপশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের তীব্রতাকে আমরা দেখেছিলাম। ঐ ক্রোধ এবং তার পরিণতিতে পরিবর্তনের আকাঙ্খা থেকে দেশের বৃহত্তর অংশে বিজেপিই যে সবচেয়ে বেশি লাভবান হতে যাচ্ছে তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লীতে আপ-এর সাড়া জাগানো উত্থানের মধ্যে বিজেপি ছাড়া অন্য দলকে ধরে পরিবর্তনের জন্য জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেছিল। কিন্তু কেজরিওয়াল ও তাঁর সহকর্মীরা সরকার গঠনের সাত সপ্তাহ পরই যেভাবে পদত্যাগ করলেন তা অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মানুষের মন থেকে আপকে মুছে দিল, আর কেজরিওয়াল যখনই মোদী-আম্বানি-আদানি গাঁটছড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতে লাগলেন তখনই আপ-এর সঙ্গে কর্পোরেট সংবাদ ও প্রচারমাধ্যমের সখ্যতা বলতে গেলে শেষ হয়ে গেল। তারপর থেকে মূলধারার রাজনৈতিক চর্চা ডুবে রইল মোদী বিপণনে, আর তার ফল এখন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি।

মোদীর প্রচার জনগণের সীমাহীন হতাশাকে ধরে 'সুদিনের' স্বপ্ন ফেরি করল। মোদীর অতীত আখ্যান সম্পর্কিত প্রশ্নকে অতীতের প্রতি অযৌক্তিক আসক্তি বলে উপেক্ষা করা হল এবং মোদীকে তুলে ধরা হল ভবিষ্যতের পথে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলার ডাক হিসাবে। মণিশঙ্কর আইয়ারের 'চা বিক্রেতা' সম্পর্কিত উদ্ধত মন্তব্য অথবা প্রিয়াঙ্কা গান্ধির অবিবেচনাপ্রসূত 'নীচ রাজনীতি'র মন্তব্যকে লুফে নিয়ে মোদী তাঁর পশ্চাদপদ জাতের মূলকে জোরের সাথে তুলে ধরলেন।

এছাড়াও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকেও সুপরিকল্পিতভাবে কাজে লাগানো হয়েছে—যেমন অমিত শাহ মুজফফরনগরের কথা তুলে 'বদলা' নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন অথবা আজমগড়কে সন্ত্রাসবাদীদের আখড়া বলেছেন, গিরিরাজ মোদীর সমালোচকদের পাকিস্তানে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, আর মোদী নিজেও বাংলাদেশীদের চলে যাওয়ার জন্য বাক্সপ্যাটরা গোছাতে বলেছেন বা আসামে গণ্ডার মারার ইস্যুটিকে এক বড় চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেছেন যার লক্ষ্য নাকি হল বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের থাকার জায়গা করে দেওয়া এবং 'ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি'র সুবিধা নেওয়া। এই বিষয়টাও বিজেপির নির্বাচনী সমাবেশে কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেনি।

অন্য প্রার্থীদের তুলনায় বেশি ভোট পেলেই বিজয়ী হওয়ার যে রীতি আমাদের রয়েছে, তার অন্তর্নিহিত অসামঞ্জস্য থেকেও বিজেপি বিপুল লাভবান হয়েছে। বিজেপি এবারে ৩১ শতাংশ ভোট পেয়েছে, অতীতে প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে তুলনা করলে এবং পশ্চিমবাংলায় ১৫ শতাংশ ও কেরলে ১০ শতাংশ সহ দেশের সমস্ত অংশ থেকেই ভোট প্রাপ্তির কথা বিবেচনা করলে এটাকে অসাধারণ বলতেই হবে। ভোট প্রাপ্তির এই হার তাকে ২৮০-রও বেশি আসন এনে দিয়েছে, যে হারটা আসলে ১৯৭৭ সালে কংগ্রেসের পাওয়া ভোটের হার থেকে ৩ শতাংশ কম, যে বছর কংগ্রেস দক্ষিণের রাজ্যগুলো ছাড়া অন্য সমস্ত রাজ্যেই পর্যুদস্ত হয়েছিল! বি এস পি উত্তরপ্রদেশে ২০ শতাংশ এবং আপ দিল্লীতে ৩১ শতাংশ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও সেখানে একটি আসনও পায়নি। ডি এম কে এবং তার মিত্ররা তামিলনাড়ুতে ২৭ শতাংশ ভোট পাওয়ার পরও একটা আসনও লাভ করতে পারেনি আর পশ্চিমবাংলায় বামেরা ৩০ শতাংশ ভোট পেয়ে মাত্র দুটি আসন লাভ করেছে। নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের সময় এসে গেছে, ইউরোপের অনেক দেশের মত দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের ভিত্তিতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থায় চলে না গেলেও প্রতিবেশী দেশ নেপালের মত আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের কিছু দিক চালু করার সময় উপস্থিত।

এবারের রায় বেশকিছু অতিকথা এবং প্রচলিত ধারণাকে চালেঞ্জ জানিয়েছে ও সেগুলোকে ঘা দিয়েছে। যে কংগ্রেসের আসন সংখ্যা কমে ৫০-এর নিচে নেমে গেছে, তাকে এখন নতুন করে নিজেকে আবিষ্কার করতে না হলেও পুনরায় উজ্জীবিত করার পথ খুঁজতে হবে। অবশ্য, সোনিয়া গান্ধি ও রাহুল গান্ধি দুজনেই নিজেদের বরাবরের আসনে বিজয়ী হওয়ায় দলকে সংহত করার উপাদান বংশের বাইরে খোঁজার বিষয়টা আপাতত স্থগিত হয়ে রইল বলেই মনে হয়। জোট রাজনীতির তথাকথিত অনিবার্যতা এবং আত্মপরিচিতির রাজনীতির অনুমিত অপরাজেয়তার স্বতঃসিদ্ধটিও অতিরঞ্জিত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উপ-জাতীয়তাবাদ বা 'বিহারি পরিচিতি'র ভিত্তিতে এককাট্টা করার রাজনীতি তৈরির নীতীশ কুমারের প্রচেষ্টা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ৪টি আসন ও ২ শতাংশ ভোট পেয়ে আপ-এর প্রথমবারের মত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার নিজ বলেই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তবে, প্রথমদিকে ১০০ আসন এবং আপ ছাড়া কেন্দ্রে কোন সরকার হবে না বলে যে দাবি সে করেছিল, তার তুলনায় এই ফল যথেষ্ট হতাশজনক।

'তৃতীয় ফ্রন্ট'-এর পথ ধরে আসন লাভ ও জাতীয় রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সি পি আই (এম) এবং সি পি আই-এর প্রচেষ্টা কানাগলিতে পৌঁছে গেছে। কংগ্রেস ও তৃণমূলের মধ্যে ভাঙ্গন এবং রাজ্যে উদীয়মান বিজেপির তৃণমূলের ভোটে ভাগ বসানোর অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পশ্চিমবাংলায় বামেদের পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রথাগত নকশা ফলদায়ী হয়নি। আমরা অর্থাৎ সি পি আই (এম এল)-ও যে চ্যালেঞ্জটার মুখোমুখি তা হল ঃ আমাদের কাজের এলাকা ও প্রভাবের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে এবং তার সাথে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রে অধিকতর আন্তক্রিয়া ও বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপকে যুক্ত করে নির্বাচনী ক্ষেত্রে আমাদের আত্মঘোষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

মোদীর প্রচারের কেন্দ্রীয় শ্লোগান বলছে, আগামী দিনগুলো হবে 'সুদিন'। যে সমস্ত কর্পোরেট ঘরানা মোদীর প্রচারে দু-হাতে টাকা ঢেলেছে তারা অবশ্যই দ্রুত তার প্রতিদান চাইবে এবং মোদীর গুজরাটে যেমন দেখা গেছে সেই ধারায় আরও অবাধ কার্যকলাপ এবং দেশের প্রাকৃতিক ও আর্থিক সম্পদের ওপর আরও বেশি নিয়ন্ত্রণ দাবি করবে। বিজেপিও এবার স্বীকার করেছে যে বিজেপির নির্বাচনী যন্ত্র পরিচালনায় আর এস এস বিরাট ভূমিকা পালন করেছে এবং তৃতীয় এন ডি এ সরকারের কার্যকলাপে সেই আর এস এস-এর ভূমিকাও ব্যাপকতর হবে। আর যে প্রশ্নটা সর্বোপরি রয়েছে তা হল ঃ মোদী পরিঘটনা কিভাবে নিজের উন্মোচন ঘটাবে।

মোদী মার্কা প্রশাসনিক ধারার বৈশিষ্ট্য হল ব্যক্তি পূজা এবং প্রতিষ্ঠানের ভিতরে ও এমনকি বাইরেও যে কোন বিরোধী কণ্ঠস্বরকে ধারাবাহিকভাবে দমন করা বা এমনকি পৃথিবী থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া। এই প্রশাসনিক ধারার মধ্যে দিয়ে গুজরাট চলেছে এবং 'গুজরাট মডেল'-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যুক্ত করে জাতীয় স্তরেও এখন তার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাওয়া হবে, এবং ভারতবর্ষে এতদিন ধরে যে গণতন্ত্রকে আমরা জেনে এসেছি তার কাছে ঐ মডেল এক নতুন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা হবে। সংখ্যালঘু এবং বিরোধী পক্ষের দলগুলোর ওপর আক্রমণের কিছু খবর ইতিমধ্যেই এসে পৌঁছেছে। অন্য কথায় বললে, মোদীর প্রচারে 'সুদিন'-এর যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা ভারতীয় জনগণ ও সংসদীয় গণতন্ত্রের কাছে 'কঠিন দিন' এবং 'চ্যালেঞ্জ ভরা সময়' হয়েই দেখা দেবে।

কর্পোরেট সংবাদ ও প্রচার মাধ্যম ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, নিচু হতে বলার আগেই তারা হামাগুড়ি দিতে প্রস্তুত। জরুরী অবস্থার কালো দিনগুলোতে রাষ্ট্র সংবাদ ও প্রচার মাধ্যমের ওপর সেন্সরসিপ চাপিয়ে দিয়েছিল, আর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ''অদৃশ্য'' কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত সুতোর টানে ''স্বেচ্ছাআরোপিত সেন্সরসিপ''। সুপরিকল্পিত নাশকতা ও কৌশলবাজির সামনে ভারতের সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিজের আত্মপ্রতিষ্ঠা কতটা করতে পারে তা দেখার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তবে, শেষমেষ ভারত কিন্তু সর্বদাই একমাত্রিক করে তোলার প্রচেষ্টা (রেজিমেন্টেশন) ও স্থিতাবস্থাকে ভেঙ্গে এগিয়ে গেছে এবং ভারতীয় জনগণ কখনই গণতন্ত্রকে মোদীতন্ত্রে পরিণত হতে দেবেন না।

(এম এল আপডেট সম্পাদকীয়, ২৩ মে ২০১৪)

সম্পাদকীয়

পুলিশের হাতে কি একুশে আইন!

ক্ষুব্ধতার প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এরাজ্যে কি একুশে আইন কায়েম হয়ে চলেছে? এখানে যে দল শাসনক্ষমতায় সেই তৃণমূল কংগ্রেস সদ্য সমাপ্ত ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময়ে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র কায়েমের অনুকূল পরিবর্তন এসেছে দাবি করে বাজার মাত করতে চেয়েছিল, এরাজ্যে গণতন্ত্র নিয়ে সরকার ও শাসকদলের বিরুদ্ধে বহু গুরুতর সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও এখানে পরিস্থিতি অন্যান্য অনেক রাজ্যের চেয়ে ভালো বলে জনমতকে প্রভাবিত করতে উঠে-পড়ে লেগেছিল, সুচতুরভাবে আরও বিশেষ বিভিন্ন বক্তব্য সহ গণতন্ত্র সম্পর্কিত তাদের প্রচারের উদ্দেশ্য সম্ভবত হাসিল হয়েছে, কারণ চৌত্রিশজন নির্বাচিত সাংসদকে শেষমেশ পকেটে পুরেছে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ হয়ে যাওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যের পুলিশী আচরণের যে নমুনা মিলতে শুরু করেছে তা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের ব্যাপারে যথেষ্ট ক্ষোভের সাথেই প্রশ্নের জন্ম দিয়ে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের পুলিশ সদ্য সদ্য এক বহুল পরিচিত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে বিনা অভিযোগে হেফাজতে নিয়ে নিল, স্রেফ এক ছুতোয়, জিজ্ঞাসাবাদের নামে হেনস্থা করল প্রায় বাইশ ঘন্টা, অভিযোগে ও মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও চালালো, কিন্তু না পেরে অগত্যা ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। পুলিশ অভিযুক্ত করার বয়ান লিখে উঠতে না পারলেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা লিখে ফেলেছিল, কিন্তু যে কোন অজানা কারণে হোক, অবশেষে বিরত হয়েছে। পুলিশ শুনিয়েছে এক বায়বীয় অভিযোগের কথা, কোন লিখিত তথ্য দেখাতে পারেনি, এ সংক্রান্ত পুলিশী ম্যনুয়ালে যা রুলস্ রয়েছে তা মানার পরোয়া করেনি; যে গোয়েন্দা অফিসার এই অপারেশানে কাপ্তেনী দেখিয়েছেন তিনি কৃতকর্মের মধ্যে কোন গর্হিত অপরাধ স্বীকার করতে নারাজ, কৈফিয়ৎ দেওয়া তো দূরের।

এই ঘটনা নিয়ে যখন চারিদিকে প্রশ্ন এবং ধিক্কার উঠছে তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মায় মুখ্যমন্ত্রী নিরুত্তর, শাসকদলের ও সরকারের হোমরা-চোমরাদের কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। শাসকপক্ষের অনুগত বিদ্বজ্জনরাও নানা অজুহাতে বিড়ম্বনা এড়াতে পাশ কাটাচ্ছেন। এই যে কান্ডটি ঘটে গেল তা মোটেই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, লঘু করেও দেখার নয়, এ পরিষ্কার ক্ষিপ্রতার সাথে সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্য হাসিল করার কারবার। অপেক্ষায় থাকা হচ্ছিল কেবল উপলক্ষের আর সময়ের জন্য। বোঝাই যাচ্ছে পুলিশের হাতে প্রদত্ত রয়েছে একুশে আইন চালানোর ক্ষমতা। সরকার ও শাসকদল চাইছে সেটা।

যে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে শায়েস্তা করার চেষ্টা চলল তিনি বর্তমান সরকারের প্রতি বশংবদের আনুগত্য রেখে চলেন না, বরং প্রয়োজনে নানা জনবিরোধী আচরণের প্রতিক্রিয়ায় সচেতন নাগরিকের ক্ষুরধার প্রতিবাদী অবস্থান প্রকাশে প্রায়শ সক্রিয়। তিনি বিগত অধঃপতিত বামফ্রন্ট আমলের পরিবর্তনের জন্যও পথে নেমেছিলেন, তবে তৃণমূলের সুরে সুর মিলিয়ে নয়, তেমনি বর্তমান আমলেও যখন যেমন বুঝছেন সরব হচ্ছেন। তার জন্য তাঁকে অতীতের মতন বর্তমান রাজত্বেও বহু মাশুল গুনতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই তাঁকে তাঁর সৃজন-নির্মাণ-পরিবেশন সংক্রান্ত সরকারি প্রযোজনা প্রাপ্তির তালিকা থেকে ক্রমে ক্রমে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। যাকে বলে ভাতে মারার বন্দোবস্ত সেটা শুরুই হয়ে গিয়েছিল, আক্রোশের যতি নেই, এবার শুরু হাতে মারার পরিকল্পনা। একইসাথে বড়মাপের উদ্দেশ্য হল, বৃহত্তর পরিধিতে ভয়াতঙ্ক ছড়ানোর বার্তা দেওয়া। যে কোন সমালোচনা ও বিরুদ্ধতাকে দমিয়ে দিতে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলতে শাসকের হুংকার আর পুলিশী হানা এই 'মা-মাটি-মানুষের' নামে চালানো রাজত্বে নতুন ঘটছে না। এই আমলের প্রায় গোড়া থেকেই সেসব ঘটে আসছে। কার্টুন কান্ড থেকে কামদুনি কান্ড, শিলাদিত্য কান্ড থেকে কলকাতার টাউন হল কান্ড, পাহাড় থেকে জঙ্গলমহল সর্বত্রই সেটা চলেছে। এমনকি সারদাকান্ডের নেপথ্যে শাসকদলের কাদের কি হাত কেমন রয়েছে সেই প্রশ্ন তোলার পরিণামে রাজ্যের কিছু সি পি এম নেতাদের নামে পুলিশের চিঠি পাঠানো হয়েছে। গ্রাম ও এলাকা স্তরে শাসকদলের রাজনৈতিক সন্ত্রাস থেকে শুরু করে হামলা ও পুলিশ দিয়ে সন্ত্রস্ত করা চলছেই।

রাজনৈতিক মানচিত্রে পট পরিবর্তন বামেদের সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ঃ মোকাবিলা কোন পথে?

সাম্প্রতিক সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির মতন উগ্র দক্ষিণপন্থী দলের উত্থান ও বিকাশ হয়েছে এটা বাস্তবতা ও দুশ্চিন্তার একটা দিক। বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির নানামাত্রিক সাফল্য চোখে না পড়ে পারে না। বিজেপি যে শুধু দুটি আসনে (দার্জিলিং-এ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সমর্থন সহ) জিতে এসেছে তাই নয়, অনেকগুলো আসনেই পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় স্থানে, প্রায় সর্বত্র উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ভোট পেয়েছে। ৬টি ছাড়া সমস্ত কেন্দ্রেই বিজেপির ভোট ১ লাখের বেশি। ৪ লাখের বেশি ভোট পেয়ে দুটি কেন্দ্রে জেতা ছাড়াও ৫টি কেন্দ্রে ৩ লাখ বা তার খুব কাছাকাছি ভোট পেয়েছে। ১৭টি কেন্দ্রে পেয়েছে ২ লাখ থেকে ৩ লাখের মধ্যে ভোট। ৫টি কেন্দ্রে ১.৫ থেকে ২ লাখ এবং আরও ৫টি কেন্দ্রে তার প্রাপ্ত ভোট ১ থেকে ১.৫ লাখের মধ্যে। দেশে এককভাবে নিরঙ্কুশ বিজয়ের পাশাপাশি এ রাজ্যে বিজেপির প্রায় ১৭ শতাংশ ভোট প্রাপ্তি শুধু অভূতপূর্ব ঘটনাই নয়, অনুমিত হিসাবনিকাশের থেকেও বেশ খানিকটা বেশি।

বাস্তবতা ও দুশ্চিন্তার অপর দিকটি হল এই উত্থান ও বিকাশ ঘটেছে বামপন্থী শক্তির মুল্যেই, তা সে বামপন্থার চরিত্র নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনাই থাক না কেন। তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে দেশজোড়া মোদী ঝড়ের মোকাবিলা করে তার দূর্গকে টিকিয়ে রাখতে পারল, এমনকি অনেকটা বাড়িয়েও নিল তার ভোট ও আসন সংখ্যা, সেখানে সি পি এম সহ বামফ্রন্টভুক্ত দলগুলো কেবল ব্যাপক মাত্রায় জনসমর্থনই হারাল না, পেল মাত্র ২টি আসন। আর সে আসন ২টিও তার নিজের মূল শক্তির জায়গায় দাঁড়িয়ে নয়, বরং কংগ্রেসের শক্ত জমিতে কংগ্রেস প্রার্থীর পরাজয়ের সূত্রে ভোটের ভাগবিন্যাসে খানিকটা বরাত জোরেই যেন পেয়ে যাওয়া। ভোট শতাংশমাত্রার নিরিখে এখনও দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও সি পি এম তথা বামফ্রন্টের দলগুলোকে আগামী দিনে এমনকি প্রধান বিরোধী আসন থেকেও সরে যেতে হতে পারে, শাসক ও প্রধান বিরোধীর জায়গাটা ভাগাভাগি হয়ে যেতে পারে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে, এমন অনুমান অনেক রাজনৈতিক ভাষ্যকারই করতে শুরু করেছেন। নিশ্চিতভাবে আগ্রাসনবাদী ও স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির এমন বাড়বাড়ন্ত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে শুধু শঙ্কিতই করছে না, তা বামপন্থার রাজনীতির সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

সি পি এম বামপন্থার যে মডেলটি অনুসরণ করে এসেছে সেখানে আপোষ প্রবণতা ক্রমেই বাড়তে বাড়তে একসময় শাসক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ওকালতির জায়গায় পৌঁছে যায় ও সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-লালগড় সহ সর্বত্র নিজেকে জনরোষের বর্শামুখে আবিষ্কার করে। পতনের প্রথম পর্বে ২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচন ও তার আগে-পরে তার জনভিত্তির একটা অংশ যদি তৃণমূল কংগ্রেসে চলে গিয়ে থাকে, তবে দ্বিতীয় ধাপে ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচন পর্বে তার জনভিত্তির আর একটা অংশ চলে গেল বিজেপিতে। আর এভাবেই এ রাজ্যে ২০০৪ সালে ৩৫ জন সাংসদের শক্তি থেকে ২০১৪-তে নেমে এল মাত্র ২ জন সাংসদ থাকা দলে। সি পি এম নেতারা আশা করেছিলেন রাইটার্স থেকে গণরোষে বিদায়ের পর খানিক চুপচাপ থাকলেই বোধহয় তৃণমূলের শাসনে বিরক্ত জনগণ তাদের দিকে কিছুটা হলেও ফিরবে, আর তৃণমূলের কিছু জনভিত্তি মোদী হাওয়ায় বিজেপির দিকে যাবে এবং ভোট ভাগাভাগিতে বামেদের বরাত বেশ খানিকটা খুলবে। এই নিষ্ক্রিয়তার সুবিধাবাদ যে তাদের পতন ঘটিয়েছে তাই শুধু নয়, তা বামপন্থীদের সামনে একটি চিরায়ত সত্যকে নতুনভাবে তুলে ধরেছে; তা হল, গণ আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের জোয়ার ছাড়া বামপন্থী রাজনীতির পক্ষে দক্ষিণপন্থী আগ্রাসনকে রোখা কোনও মতেই সম্ভব নয়, বরং সেই স্রোতে তারও ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বামফ্রন্টের বাইরে থেকে যাওয়া বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ও সংগ্রামী বাম শক্তির সামনেও এবারের লোকসভা নির্বাচন কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন হাজির করেছে। আগ্রাসী দক্ষিণপন্থাকে রোখার দায়িত্ব শুধু বামফ্রন্টের ওপরেই ন্যস্ত থাকতে পারে না, তা সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিরই বিশেষ ঐতিহাসিক দায়িত্ব। অন্যান্য নানা প্রশ্নের মতন এই প্রশ্নেও আপোষকামী বামের সঙ্গে সংগ্রামী বামেদের ঐক্য ও বিতর্কের সম্পর্ক রয়েছে। আপোষকামী ও সমর্পণবাদী বামপন্থা যে দক্ষিণপন্থাকে রুখতে শেষপর্যন্ত সক্ষম হয় না, বরং তার রাস্তা তৈরী করে দেয়, এবারের লোকসভা নির্বাচন সেই বার্তা নতুন করে দিল। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থার উত্থান ও বিকাশের মুখে দাঁড়িয়ে তাকে প্রতিহত করার জন্য যে ব্যাপক গণভিতের দরকার, তার অভাব তৃতীয় ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর দীর্ঘদিনের সীমাবদ্ধতা হয়েই থাকছে, সেটাও এই নির্বাচনে আর একবার বোঝা গেল। নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়ানো বামপন্থার দুই শিবিরের আন্তঃসম্পর্ক কোন দিকে যাবে সে বিষয়ে আলোচনা বাম গণতান্ত্রিক মহলে স্বাভাবিকভাবেই উঠতে শুরু করেছে। আপোষকামী চরিত্রের বামফ্রন্টের শাসক থাকা অবস্থায় বামপন্থার স্খলনগুলো নিয়ে সোচ্চার থাকার ও জনগণের সঙ্গে শাসকের দ্বন্দ্বে জনগণের পাশে থাকার দায়িত্ব সংগ্রামী বামশক্তিগুলোকে পালন করতেই হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষত চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাজনীতির (যাকে অনেকেই ফ্যাসিবাদ পর্যন্ত আখ্যা দিতে চান) উত্থানের সমস্ত সম্ভাবনা জাগ্রত হয়ে ওঠার পর্বে এই অবস্থানে নীতি ও কৌশলগত ক্ষেত্রে আরও কি নতুন পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন তা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করছেন।

এই প্রসঙ্গেই শুধু এটুকুই মনে রাখার পরিস্থিতির মৌলিক পরিবর্তন কমিউনিস্টদের অনেক নমনীয় হওয়ার শিক্ষা দেয়। ইউরোপে ফ্যাসিবাদের উত্থানের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার সপ্তম কংগ্রেসে পূর্বতন নীতি পরিবর্তন করে ফ্যাসিবিরোধী গণফ্রন্ট গঠনের নীতি গ্রহণ করেছিল আর এই প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছিল দিমিত্রভের বিখ্যাত ক্লাসিক 'দ্য পিপলস ফ্রন্ট' (১৯৩৬)। বলাবাহুল্য ফ্যাসিবিরোধী ব্যাপক ঐক্যর ডাক দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে ফলিত রূপ পেয়েছিল ও জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল।

১৯৭২ সালের ভারতে ফ্যাসিবাদী উত্থানের সম্ভাবনার লক্ষণের প্রেক্ষিতে কমরেড চারু মজুমদার কমিউনিস্টদের অন্তরের প্রসারতার কথা তুলেছিলেন বৃহৎ জোটবদ্ধতার প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দিয়ে। ৯ জুন ১৯৭২ সালে কমরেড চারু মজুমদার 'জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ' শিরোনামাঙ্কিত এক লেখায় লেখেন, ''এমনকি যারা একসময়ে আমাদের প্রতি শত্রুতা করেছে, বিশেষ পরিস্থিতিতে তারাও আমাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে এগিয়ে আসবে। এইসব শক্তির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মতো মনের প্রসারতা রাখতে হবে। মনের প্রসারতা কমিউনিস্টদের গুণ। জনগণের স্বার্থই আজ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের দাবি জানাচ্ছে। জনগণের স্বার্থই পার্টির স্বার্থ।'' এই শিক্ষাকে মাথায় রেখে আমাদের সর্বস্তরে আলোচনা সাপেক্ষে খোলা মনে রাজনৈতিক বিন্যাসের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

বামপন্থার রাজনৈতিক শক্তির নতুন বিন্যাস অবশ্যই জরুরী, কিন্তু কেবলমাত্র সেটিই এককভাবে রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বর্তমান ভারসাম্যকে বদলে দিতে পারবে না। কারণ বামপন্থা আমাদের দেশে এবং রাজ্যে যে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে তা বহুমাত্রিক। সাংগঠনিক দুর্বলতা হিসেবে ;যা প্রতিভাত হচ্ছে তা অনেকাংশে মূলত রাজনৈতিক দুর্বলতার থেকেই উদ্ভুত। অন্যদিকে দেশে বামপন্থার বিকাশের স্বাভাবিক শর্তগুলো শুধু মজুত আছে তাই নয়, তা ক্রমবর্ধমানও। দেশে অর্থনৈতিক সঙ্কট তীব্র হচ্ছে, মূল্যবৃদ্ধি লাগামছাড়া হচ্ছে ও বিভিন্ন শ্রেণী-বর্গের মানুষ নানা ধরনের সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছেন নিত্যদিন। বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছে, শ্রমিকের মজুরী সংকোচন হচ্ছে ব্যাপকভাবে, চাষের খরচ লাগামছাড়া অথচ ফসলের ন্যায্যমূল্য মিলছে না আর তা ঋণগ্রস্ত কৃষককে হাজারে হাজারে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শাসক ও কর্পোরেটের মধ্যে অনৈতিক আঁতাত (ক্রনি ক্যাপিটালিজম)-এর ছবি খোলা পাতার মত উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক আত্মঘোষণার নানা সীমাবদ্ধতা ও শ্রমিক আন্দোলনে আমাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্ন সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়েও ব্যাপক অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। সামাজিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজবিন্যাস, তার দ্বন্দ্ব ও প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমীকরণকে আয়ত্ত করা ও তার ভিত্তিতে লড়াই আন্দোলনের রূপরেখা তৈরী করার প্রবণতা হারিয়ে গতানুগতিক অভ্যাসবাদে লিপ্ত হয়ে থাকা কোনও ভাবেই বাম আন্দোলনে প্রয়োজনীয় সজীব উপাদান সংযোগে সক্ষম হবে না।

সামাজিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে নতুন সময়ের সমাজবিন্যাসকে বোঝা ও তার দ্বন্দ্বগুলোকে আয়ত্ত করা বাম আন্দোলনে বরাবরই স্থিতাবস্থা ভাঙা ও নতুন সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে। সোভিয়েত মডেলের আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর চীনে কমিউনিস্ট পার্টির মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে তার নিজস্ব চীনা পথে যাত্রার পেছনে মৌলিক অবদান রেখেছিল মাওয়ের চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ ও প্রধান দ্বন্দ্বগুলোর ওপর অনুসন্ধানী আলোকপাত। ভারতীয় সমাজ গত দু-দশকে নয়া উদারীকরণের নীতিমালার জমানায় যদি আমূল পরিবর্তিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে নয়া প্রজন্মের চিন্তা-চেতনার রূপ-রীতি ও ভাষা যদি লক্ষ্যণীয়ভাবে বদলে গিয়ে থাকে, তবে তাকে আয়ত্ত করার জন্য ব্যাপক সামাজিক অনুসন্ধান প্রয়োজন। প্রয়োজন বদলে যাওয়া সমাজ, কাজের ধরন, আন্দোলনের সম্ভাব্য বিষয় ও রীতি পদ্ধতিগুলোকে বোঝা। সময় সেই হস্তক্ষেপের জরুরী দাবি জানাচ্ছে। বিভিন্ন সংকট থেকে বিভিন্ন দেশকালে বামপন্থা তার সৃজনশীল ও দায়বদ্ধ রাজনীতির মধ্যে দিয়ে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে, নিজের শক্তি বৃদ্ধিতে সমর্থ হয়েছে। আমাদের রাজ্য ও দেশেও তা না হওয়ার কোন কারণ নেই। বরং ক্রমবর্ধমান অসাম্য ও জনগণের ব্যাপক অংশের মৌলিক সঙ্কট বৃদ্ধি পাওয়ার পর্বে সঠিক হস্তক্ষেপের সূত্রে তার উজ্জ্বল সম্ভাবনা সব সময়েই বর্তমান থাকছে।

- সৌভিক ঘোষাল

কমরেড সুনীতিকুমার ঘোষের স্মরণসভা

১১ মে আসানসোলে প্রয়াত বর্ষীয়ান কমরেড সুনীতিকুমার ঘোষের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় গত ২৭ মে স্টুডেন্টস হলে। সভা আয়োজনে ছিল ''সুনীতিকুমার ঘোষ স্মরণ কমিটি''। তার আগে আসানসোল শহরেও গত ২৫ মে স্মরণসভা হয়।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রয়াত কমরেডের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর সভারম্ভের মুখ খোলেন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য। শুরুতে স্মরণ কমিটি প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে—''চারু মজুমদার পরিচালিত নকশালবাড়ির ঐতিহাসিক সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম সুনীতিকুমার ঘোষকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। 'নকশালবাড়ি ও কৃষক সংগ্রাম সহায়ক কমিটি'কে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যে কেন্দ্র গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়, তিনি তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। এর পরে এ আই সি সি আর এবং এ আই সি সি সি আর গড়ে ওঠে। 'দেশব্রতী' ও 'লিবারেশন' পত্রিকা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৯৬৭-র ১১ নভেম্বর 'লিবারেশন'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭২-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এই কেন্দ্রীয় মুখপত্রের সম্পাদক। সি পি আই (এম এল) গড়ে ওঠার পর 'লিবারেশন' বিপ্লবী পার্টির মুখপত্রে পরিণত হয়। অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত ছাড়াও হংকং, ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, কানাডা, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও লিবারেশনের পাঠক ছিলেন। ... তাঁর লেখা গ্রন্থগুলো আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক কর্মী, শিক্ষাবিদ ও সাধারণ পাঠকদের কাছে শিক্ষণীয় গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলন তাঁর এই মূল্যবান ও সুতীক্ষ্ণ গবেষণাসমূহের উৎস, আর তাঁর গবেষণা পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলনগুলোকেও পুষ্ট করেছে।

সুনীতিকুমার ঘোষ এক বিপ্লবী আশাবাদ আমৃত্যু লালন করে গেছেন। ভারতবর্ষের বিপ্লব যে ভবিষ্যতে—নিকট বা সুদূর—বহু মানুষের আত্মদানের মধ্যে দিয়ে জয়যুক্ত হবে তা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। বর্তমানের প্রতিকূল অবস্থা বিপ্লবী কমিউনিস্টরা কাটিয়ে উঠবেন। তাঁর বাড়ির সামনের কামিনী গাছের ঝলসানো পাতাগুলো ঝরে যাবে, সবুজ পাতা আসবে গাছে। জীবন-মৃত্যুকে ছাপিয়ে যাবে। সেই নতুন সমাজে মুনাফার লালসা নয়, যুদ্ধবাজদের হুমকি নয়, বরং মানবিক মূল্যবোধগুলো পশুশক্তির ওপর প্রভুত্ব করবে।

বিপ্লবী কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী কমরেড সুনীতিকুমার ঘোষের স্মৃতির প্রতি এই স্মরণ কমিটি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাঁর পরিবারের মানুষদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।''

প্রারম্ভিক বক্তব্য পরিবেশনের পর অন্যান্য বক্তারা একে একে বক্তব্য রাখেন। স্মৃতিচারণ করেন স্মরণ কমিটির অন্যতম সদস্য এবং কলকাতায় সুনীতিকুমার ঘোষের কয়েক দশকের সমবায় আবাসন প্রতিবেশী ও বামপন্থী সমাজকর্মী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। স্মৃতির সরণী পরিক্রমা করেন সন্তোষ রাণা, অসীম চট্টোপাধ্যায়, মুক্তেশ ঘোষ, অনিমেষ চক্রবর্তী, তিলক দাশগুপ্ত, সৃজন সেন, কাঞ্চন কুমার এবং আরও অনেকে। এমনকি সুদূর দিল্লী ও উত্তরপ্রদেশ থেকেও কমরেড সুনীতি ঘোষের দুই অনুরাগী সাথী এসেছিলেন, বক্তব্য রেখেছেন। স্মৃতিচারণাকারীদের বক্তব্যে প্রয়াত কমিউনিস্ট বিপ্লবী নেতার দীর্ঘ জীবনের গভীর মননশীল গবেষণা কর্ম ও অবদানের কথা উঠে আসে। তেমনি বর্তমান জাতীয় ও রাজ্য পরিস্থিতিকে মোকাবিলার জন্য প্রয়াত কমরেড ঘোষের আকর শিক্ষাগুলোকে হাতিয়ার করার কথাও উঠে এসেছে। এছাড়া স্মৃতিভাণ্ডারকে জীবন্ত করে রাখার জন্য আরও কিছু কিছু পরামর্শও শোনা গেল।

স্মরণসভা ছিল খুবই ভাবগম্ভীর। দুই তরুণী সাথীর গলায় ''থাক না হাজার অযুত বাধা, কিসেরই ভয় ...'' গান সভাকে করে তোলে টানটান। সভাপতিত্বে ছিলেন অমিত ভট্টাচার্য, সঞ্চালনায় অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রোতাদের আসনে উপস্থিত ছিলেন বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষেরা, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিগতভাবে। বিশেষত উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত নেতার কন্যা স্বাতী ঘোষ।

কমরেড সুনীতিকুমার ঘোষ ও তাঁর শিক্ষাগুলো বেঁচে থাকবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী মতাদর্শ-রাজনীতি এবং মেহনতী মানুষের সংগ্রামের মধ্যে।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

চলনে মননে ঋজুতার প্রতিমূর্তি সুকুমারীদি চলে গেলেন

সুকুমারীদির কাছে দেওয়া কথা রাখা হল না, তার আগেই চলে গেলেন তিনি। বেশ কয়েক মাস আগে আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। সেই সময়ে উনি বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না, প্রায় শুয়ে শুয়েই কথা বললেন আমাদের সাথে বহুক্ষণ। জিজ্ঞাসা করলেন রাজনীতির কথা। আমি (অমিত দাশগুপ্ত) যেহেতু রাজনীতি করি এবং সি পি আই (এম এল), তাই সে ব্যাপারেই আলাপচারিতা চলছিল। খবর রাখছিলেন রাজ্য ও দেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত কিছুর, আরও জানতে চাইছিলেন আমাদের কাছ থেকে। তিনি খেয়াল রাখতেন সি পি আই (এম এল)-এরও, প্রত্যাশা করতেন আমাদের কাছে। বামপন্থী রাজনীতিতে তাঁর অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু যাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন সমাজবাদের পথে এগোবেন, তাদের উপরে বিশ্বাস তাঁর টলে গিয়েছিল সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম পর্বে। নবান্ন পত্রিকাকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন, ''সি পি এম অনেক অন্যায় কাজ করেছে। প্রতিবাদ হওয়াই উচিৎ। আমি সি পি এম সমর্থকই ছিলাম। কিন্তু দেখলাম, যে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়াই করবো সেই দেওয়ালটাই নড়ছে।'' কিন্তু বামপন্থায় তাঁর বিশ্বাস কখনো টাল খায়নি। তাই দেখা হলেই তিনি খোঁজখবর নিতেন সি পি আই (এম এল)-এর। আমাদের পরিচয়ের গণ্ডীতে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক রাজনৈতিক। মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই শেষ যেদিন দেখা করেছিলাম তাঁর সাথে, আমার সাথে আমার এক সহকর্মী ছিলেন, তাঁকে সুকুমারীদি প্রশ্ন করেন, ''আপনিও কি রাজনীতি করেন?'' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'না তেমন কিছু নয়, ঐ একটু আর কি''। শুনে তাঁর উত্তর ছিল, ''ওরকম হয় না। করলে পুরোটা করতে হয়।''

আমাদের সঙ্গে সুকুমারীদির আলাপ ২০০৮ সাল নাগাদ, যখন সারা পশ্চিমবঙ্গে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম ঘটে যাওয়ার পরে বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নাড়াঘাটা শুরু হয়েছে। দিল্লীতে অধ্যাপক সুমিত সরকার (সুকুমারীদির জামাই) তাঁর কথাবার্তায়, লেখাপত্রে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছেন। সুকুমারীদিও লিখেছেন বামফ্রন্ট তথা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের কৃষক দমননীতির বিরুদ্ধে। আমাদের কমরেড স্বপন লাহিড়ীর (সপা) বাড়ীর উল্টোদিকের ফ্লাটে সুকুমারীদি এসে বাস করছেন তখন। তার কিছুদিন আগে তিনি যেখানে থাকতেন সেখানে চোর ঢোকে এবং তার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে তিনি আহত হন। সে বাড়ী ছেড়ে তিনি নাকতলার ফ্লাটে আসেন। সপার সূত্রে আমরা তাঁর সাদর সঙ্গ পাই। আরেকজন কমরেড শীলা দে সরকার তাঁর কাছে নিয়মিত যেতেন। শীলার সাথে আমি যতবার তাঁর কাছে গিয়েছি ততবারই শীলার প্রতি অনুযোগ করেছেন যে, শীলা অনেকদিন আসেনি। আর আমরা গেলে পরেও তিনি আবার আসতে বলেছেন বারবার। বাড়ী গেলে কিছু না কিছু মিষ্টি দিয়ে আদরও করেছেন। তাঁর সবসময়ের সাথী সন্ধ্যাকে বলেছেন চা দিতে। অবশ্য সন্ধ্যার সঙ্গেও আমাদের আলাপ হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে যখন তাঁর কাছে যেতাম তিনি তখন পড়ে গিয়ে যথেষ্ট চোট পেয়েছেন। একটি ওয়াকার নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আসতেন। কম বলতেন। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন, অবশ্যই রাজনীতির কথা। তাঁর প্রজ্ঞার কাছে আমাদের জ্ঞান শিশুসুলভ হলেও তিনি আমাদের জানাটাকেই বেশী করে দেখাতেন। প্রবল পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিত্ব তাঁর সেই ওয়াকার নিয়ে হাঁটা-চলাতেও ফুটে বেরোত। কোনভাবে বিনয়ের আড়ম্বর ছাড়াই কীভাবে বিনয়ী থাকা যায় তা শিখেছিলাম তাঁর কাছে।

''নবান্ন'' পত্রিকার পক্ষ থেকে তাঁকে সেই 'পরিবর্তন'-এর আওয়াজের সময়ে একটি সাক্ষাতকার নিতে গিয়েছিলাম। সেই সাক্ষাতকারে তিনি আমাদের প্রশ্ন করেছিলেন প্রায় ততটাই যতটা আমরা করেছিলাম তাঁকে। পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, ''পরিবর্তনটা তপ্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত আগুনে-ও হতে পারে''। বলেছিলেন, লালঝাণ্ডার প্রতি যে আক্রোশ সেই সময় গরীব কৃষকদের মধ্যেও তৈরী করা গিয়েছিল তার জন্য দায়ী সি পি এম। বলেছিলেন, ''এই অবস্থাটা তৈরী করল সি পি এম তাঁদের আচার আচরণ দিয়ে''। তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা ব্যানার্জীর কাছে যখন পরিবর্তনপন্থী বুদ্ধিজীবীরা মাথা বিকোচ্ছেন সেই সময়েই তিনি সি পি এম তথা বামফ্রন্টের কঠোর সমালোচনা করা সত্ত্বেও মমতার সার্বিক বিরোধিতা করেছেন। অতি সম্প্রতি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অসুস্থ অবস্থায়ও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক মত প্রকাশ করেছেন তিনি। তিনি ছিলেন অক্লান্ত মার্ক্সিস্ট। তাই বলেছিলেন, ''আমি মার্ক্সিস্ট, মনে করি না এর থেকে বড় কোন তত্ত্ব আছে।''

নবান্ন আর পশ্চিমবঙ্গ গণসংস্কৃতি পরিষদের আয়োজনে, সুকুমারীদির বাড়িতে আমরা প্রয়াত সুচিত্রা মিত্রকে স্মরণ করেছিলাম একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। সেখানে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল তারুণ্যের ছটায় উজ্জ্বল। কে বলবে তিনি অসুস্থ, তার বয়স নব্বই। অনুষ্ঠানে গান গেয়েছিল কয়েকজন অল্পবয়সী ছাত্রছাত্রী এবং গণসংস্কৃতি পরিষদের কয়েকজন, আর গান গেয়েছিলেন তিনি। জানিয়েছিলেন কী দারুণ সখ্যতা ছিল তাঁর আর সুচিত্রা মিত্রের।

সুকুমারীদির অসাধারণ পাণ্ডিত্য বিষয়ে ওয়াকিবহাল মানুষেরা হয়তো সম্যক জানেন। আমরা তাঁর কয়েকটা বই হয়তো পড়েছি। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৩৫, তা জেনেছি। তিনি নিজেই বলেছেন আমাদের যে, খ্রীষ্টান পরিবারে তাঁর জন্ম, সংস্কৃত নিয়ে পড়াশুনা করেছেন ভিক্টোরিয়া কলেজে। এম এ পাশ করেন ইংরেজীতে। বহু বছর পরে সংস্কৃতেও তা তিনি পাশ করেন। প্রথমে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে ইংরেজী পড়াতেন। তারপরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে যোগদান করেন। এর পরে পড়ান ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েরই সংস্কৃত বিভাগে। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অগাধ। সে বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার মত ধৃষ্টতা আমাদের ছিল না, কিন্তু তিনি সেসব বিষয়েও আমাদের সাথে কথা বলতে কোনরকম ইতস্তত করতেন না।

সুকুমারী ভট্টাচার্যের বইগুলো আমাদের জন্য থেকে গেল। আমরা যারা প্রাচীন ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতিকে জানতে চাই, তার সীমা ও সীমাবদ্ধতাগুলো সহ তার অনন্যতাকে বুঝতে চাই, তাদের জন্য এই বইগুলো অনন্য সম্পদ। সংস্কৃত সাহিত্যের ধ্রুপদী পর্ব নিয়ে তাঁর লেখা বিখ্যাত বইটি (ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস) সমকালীন প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে তুলে আনে বদলে যেতে থাকা সংস্কৃত সাহিত্যের আদলটিকে। স্বল্প পরিসরে এক একটি যুগ ও এক একজন লেখকের ওপর নিপুণ বিশ্লেষণী আলো ফেলেন লেখিকা। সে তুলনায় বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অনেক বেশি বিস্তারিত। চার বেদ, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বেদাঙ্গসূত্র সহ ঋক বৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের ওপর এই বইটি ছাত্র গবেষক ও সাধারণ অনুসন্ধিৎসু পাঠকের কাছে এক চিরন্তন ক্লাসিকের মর্যাদা পায়। তুলনায় রামায়ণ ও মহাভারত নিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্যের বিস্তারিত লেখা অল্প। 'রামায়ণ ও মহাভারতের আনুপাতিক জনপ্রিয়তা' খানিকটা পাঠের ইতিহাস ধরণের পুস্তিকা। তবে 'প্রাচীন যুগের সমাজ ও সাহিত্য' এবং 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ'-এর মতো বইগুলোতে তিনি প্রসঙ্গ হিসেবে মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণের নানা উদাহরণ বারবার ব্যবহার করেছেন। এই বইগুলো ছাড়াও প্রাচীন ভারতকে বোঝার জন্য তাঁর বিষয় ভিত্তিক কিছু বই, যেমন ''বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য'', ''বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য'', ''নিয়তিবাদ ঃ উদ্ভব ও বিকাশ'', ''বিবাহ প্রসঙ্গে'' ইত্যাদি বিশেষ গুরুত্ব দাবি করতে পারে। তিনি ছিলেন বিখ্যাত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ স্নেহধন্যা ও শিষ্যাপ্রতিম। গুরুর প্রতি ঋণ এবং সারস্বত সাধনার দিকপালদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর লেখা জীবনী গ্রন্থটি। বেশ কিছু বইয়ের যোগ্য সম্পাদনাও তিনি করেছেন, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমী সংস্কৃত প্রকরণ ''মৃচ্ছকটিক''।

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম। শেষ যেদিন তাঁর কাছে গিয়েছিলাম, ফিরে আসার সময় তিনি বলেছিলেন, ''আবার আসবেন''। আমরা বলেছিলাম আসবো। তিনি বলেছিলেন, ''ভুলে যেও না, এসো কিন্তু''। কখনও আপনি বলতেন কখনও তুমি। সেই যাওয়া আর হয়ে উঠল না। যদিও তাঁর কাছে গেলে মন ভারী ভাল হয়ে যেত। যখন সাক্ষাতকার নিয়েছিলাম, সেদিন চলে আসার সময় বলেছিলাম যে আপনার কাছে আসতে পেরে ভালই লাগল, আবার আসব। উনি রসিকতা করে বলেছিলেন, ''হ্যাঁ, রকমারি, সুকুমারী, আলমারি —এসব তো ভাল লাগার জিনিস। আবার আসবেন তো?'' অত বড় মাপের মানুষ আর কেউ হয়তো ঐভাবে আর ডাকবেন না।

- সৌভিক ঘোষাল ও অমিত দাশগুপ্ত

কমরেড মুকল সিন্‌হা লাল সেলাম

সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের জন্য সাহসী অক্লান্ত যোদ্ধা

সক্রিয় কর্মী ও আইনজীবী মুকুল সিন্‌হা ফুসফুসে কর্কট রোগাক্রান্ত অবস্থায় গত ১২ মে আমেদাবাদে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। কমরেড সিন্‌হা ছিলেন একজন সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, তাছাড়াও নাগরিক স্বাধীনতা ও ন্যায়ের জন্যও বহু স্মরণীয় লড়াই চালিয়ে গেছেন, আর তার অধিকাংশই নরেন্দ্র মোদীর ঘাঁটিতে গুজরাটে, সাম্প্রদায়িক গণহত্যা ও হেফাজতে হত্যার যারা শিকার হয়েছেন তাঁরা যাতে ন্যায়বিচার পান সেই আশা তিনি বীরের মতই জীবন্ত রেখে গেছেন।

আমেদাবাদে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ গবেষক থাকাকালীন মুকুল সিন্‌হা একজন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক হয়ে ওঠেন যখন ১৯৭৯ সালে ১৩৩ জন ব্যক্তিকে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কর্মচ্যুত করা হয়। তারপরে ১৯৮০-র দশক জুড়ে তিনি তাঁর স্ত্রী ও আজীবন সহযোদ্ধা কমরেড নির্ঝরী সহ বহু শ্রমিক সংগ্রাম সংগঠিত করেন। তিনি আইন বিষয়ে ডিগ্রী অর্জন করেন এবং তা এইসমস্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আরও সমর্থ হতে প্রচুর কাজ দেয়।

কমরেড মুকুল এবং নির্ঝরী একসাথে মিলে একটি নাগরিক অধিকার রক্ষার সংগঠন তৈরী করেন, তার নাম ''জন সংঘর্ষ মঞ্চ''। এই সংগঠন ২০০২-এর গণহত্যার শিকার হওয়া লোকেদের ন্যায়বিচার আদায়ের সংগ্রাম সংগঠিত করতে যোগ্যতার সাথেই কাজ করে এসেছে।

মুকুল সিন্‌হা গুজরাটে, সাদিক জামাল, ইশরাত জাহান, সোহরাবউদ্দিন শেখ ও তুলসী প্রজাপতিকে ভুয়ো সংঘর্ষে হত্যার সত্য উদ্‌ঘাটনের আইনী সংগ্রামে এক দুর্দান্ত সাহসী অংশ নিয়েছিলেন।

মুকুল সিন্‌হা বিশেষ স্মরণীয় এজন্যও যে তিনি কংগ্রেস শাসিত মণিপুর রাজ্যে ভুয়ো সংঘর্ষে বলি হওয়া লোকেদের পরিবার-পরিজনদের প্রচুর সহায়তা করেছিলেন। মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে সংঘটিত সহস্রাধিক হত্যাকাণ্ডের বেশ কিছু অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সুপ্রীম কোর্ট ঐ কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়ের নেতৃত্বে এবং আরও দুই সদস্য মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জে এম লিংদো ও কর্ণাটকের এক প্রাক্তন ডেপুটি জেনারেল অফ পুলিশ সহ এক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন গঠন করে। ঐ কমিশনের সামনে মণিপুরের যুবতী বিধবাদের সমিতিকে সহায়তা করতে মুকুল সিন্‌হা পুলিশ ও মণিপুর রাইফেলসের অফিসারদের সবচেয়ে বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। ফলে কমিশন দাগ কাটার মত রিপোর্ট পেশ করে এবং ঘোষণা করে যে সমস্ত 'সংঘর্ষ' সংঘটিত করা হয়েছিল অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। গুজরাট এবং মণিপুরের ভুয়ো সংঘর্ষ প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কমরেড মুকুল সিন্‌হা উল্লেখ করেছেন, ''গুজরাটের সংঘর্ষ ও মণিপুরের সংঘর্ষগুলোর মধ্যে প্রচুর মিল পাওয়া গেছে, কিন্তু উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অবশ্য কিছু সুনির্দিষ্ট পার্থক্য থেকেছে। গুজরাটের সংঘর্ষগুলো যেখানে মুখ্যমন্ত্রীকে একজন হিন্দু অবতার হিসেবে তুলে ধরতে পুরোদস্তুর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; অন্যদিকে মণিপুরের সংঘর্ষগুলো পুরোপুরি সরকারি অনুদানকে লোপাট করানোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অভিন্নতার বিষয়টি হল তা সে বিজেপি বা কংগ্রেস হোক, রাজনৈতিক নেতাদের খাঁই মেটাতে সাধারণ নাগরিকদের কচুকাটা করা চলছে।''

মুকুল সিন্‌হা নয়া সমাজবাদী আন্দোলনের উদ্দেশ্যে গঠন করা একটি বামপন্থী দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম এক সদস্য ছিলেন। কমরেড মুকুল সিন্‌হা গুজরাটে তথাকথিত 'হারিয়ে যাওয়া' কেসগুলো নিয়ে লড়েছেন, মোদীর কর্তৃত্ববাদী জমানার প্রতি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন, ফলবশত মোদীর অনেক পুলিশ-প্রশাসনিক অফিসারদের জেলে ঢুকতে হয়েছে এবং ন্যায়ের জন্য সেইসমস্ত সংগ্রাম জারীও থাকবে।

১৬ মে-র পর কেন্দ্রে মোদী সরকার কায়েম হলেও এই সরকার আমরা জানি কখনই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে না, শ্রমিক-সংখ্যালঘু-নারী ও সক্রিয় কর্মীদের অধিকার রক্ষার জন্য লড়বে না। তবে মুকুল সিন্‌হাদের জগৎ যা কিনা সত্যিকারের জীবন এবং আমাদের গণতন্ত্রের হৃদয় কি সেটা বুঝিয়ে দেয় তা সর্বদাই থাকবে। মুকুল সিন্‌হার ইচ্ছাগুলো মরবে না, সেগুলো বিভিন্ন সংগ্রামে বেঁচে থাকবে, অনুপ্রাণিত করে চলবে আর সাহস ও লেগে থাকার নিষ্ঠা যোগাতে থাকবে অন্যান্য সক্রিয় কর্মীদের।

কমরেড মুকুল সিন্‌হা বেঁচে থাকবেন সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার রণাঙ্গনে।

''আজকের দেশব্রতী'' সম্পাদকমণ্ডলী
অনিমেষ চক্রবর্তী, সুকান্ত মণ্ডল, অতনু চক্রবর্তী, জয়দীপ মিত্র, অমিত দাশগুপ্ত,
সৌভিক ঘোষাল ও কল্যাণ গোস্বামী

সি পি আই (এম এল) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে মুদ্রক ও প্রকাশক কার্তিক পাল কর্তৃক ক্যালকাটা গ্রাফিক প্রাইভেট লিমিটেড, ৩এ মানিকতলা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা-৫৪ হইতে মুদ্রিত ২১/১/১ ক্রীক রো, কলকাতা-১৪ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ অনিমেষ চক্রবর্তী। ₹ ১.০০ ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ২২৬৫ ১৬৭৯ e-mail : deshabrati@gmail.com//cpimlwb@yahoo.com